(iv) **মাধ্যমিক নরমোব্লাস্ট** (Intermediate normoblast) : এরা 10-14μ ব্যাসযুক্ত। নিউক্লিয়াসটি বেশ সুস্পষ্ট কিন্তু নিউক্লিওলাসবিহীন। এই স্তরে হিমোগ্লোবিনের অধিকাংশ তৈরী হয়। এই কোষ বিভাজিত হয়ে পরবর্তী নরমোব্লাস্ট গঠন করে।

(v) **পরবর্তী নরমোব্লাস্ট** (Late normoblast) : এরা আকারে বেশ ছোট (7-10μ)। নিউক্লিয়াসটি নিবীড় হয়ে আসে। নিউক্লিওলাস থাকে না। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর পরেই নিউক্লিয়াসটি বিলুপ্ত হয়ে রেটিকিউলোসাইট দশার উদ্ভব ঘটে।

(vi) **রেটিকিউলোসাইট** (Reticulocyte) : ইহা নিউক্লিয়াসবিহীন ক্ষুদ্রাকার (7μ) কোষ। সাইটোপ্লাজমে জালিকা উপস্থিত। এই দশা প্রান্তীয় সংবহন তন্ত্রে প্রবেশ করে এবং পরিণত লোহিত কণিকায় রূপান্তরিত হয়।

(vii) **পরিণত লোহিত কণিকা** (Normal or Mature erythrocyte) : ইহা রক্তস্থিত স্বাভাবিক লোহিত কণিকা। এদের গড় ব্যাস 7.2 μ। এরা নিউক্লিয়াসবিহীন, হিমোগ্লোবিনযুক্ত দ্বি-অবতল কণিকা বিশেষ এবং রক্তে অক্সিজেন পরিবহণে সক্ষম। প্রোএরিথ্রোব্লাস্ট থেকে রেটিকিউলোসাইট হ'তে প্রায় 7 দিন এবং রেটিকিউলোসাইট থেকে পরিণত লোহিত কণিকা সৃষ্টি হতে 2 দিন সময় লাগে।

H. **লোহিত কণিকার বিপাক** (Metabolism of R.B.C.) : লোহিত কণিকায় মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকায় এখানে TCA চক্র সাধিত হয় না। লোহিত কণিকায় গ্লুকোজ থেকে জৈবশক্তি (ATP) উৎপন্ন হয় প্রথমত, এম্বডেন মেয়ারহফ্ বিক্রিয়া পথের দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত, পেন্টোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথের দ্বারা। এভাবে উৎপন্ন জৈবশক্তি কোষের সক্রিয় পরিবহণে এবং কোষের আকৃতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

I. **লোহিত কণিকার পরিণতি** (Fate of R.B.C.) : বার্দ্ধক্য অবস্থায় লোহিত কণিকার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং ক্ষণভঙ্গুর হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ লোহিত কণিকাকে পয়কিলোসাইট (poikilocyte) বলে। এই প্রকার লোহিত কণিকা অল্প চাপেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ভগ্ন অংশগুলি যকৃৎ ও প্লীহার R.E. কোষ দ্বারা ভক্ষিত বা আগ্রাসিত হয়। হিমোগ্লোবিনের পরফাইরিন রিং ভেঙে 4 টি পাইরোল গ্রুপ একটিমাত্র চেনে অবস্থান করে। এই লব্ধ পদার্থ কোলেগ্লোবিন (coleglobin) এবং ভারডোহিমোগ্লোবিন (verdohaemoglobin) নামে পরিচিত। পরবর্তী পর্যায়ে ইহা বিশ্লিষ্ট হয়ে প্রোটিন (protein) ও হিম (haem) উৎপন্ন করে। প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। হিমের লৌহঘটিত অংশ ফেরিটিন (ferritin) ও হিমোসিডারিন (haemosiderin) দেহে সঞ্চিত হয়। হিমের বাকী অংশে বিলিভার্ডিন (biliverdin) রূপান্তরিত হয়। ইহা পরে বিজারিত হয়ে বিলিরুবিন (bilirubin) উৎপন্ন করে।

রক্তচাপকে সাধারণতঃ (SYS) রূপে প্রকাশ করা হয়।

(ii) কার্যকরী রক্তচাপ বা অ-পূর্বপরিকল্পিত চাপ : সাধারণ অবস্থায় [illegible] কোন ব্যক্তির যে রক্তচাপ রেকর্ড করা হয় তাকে কার্যকরী রক্তচাপ বা অ-পূর্বপরিকল্পিত চাপ বলে।

২. স্পন্দন চাপ ও চাপ স্পন্দন (Pulse pressure and Pressure pulse) : সর্বোচ্চ রক্তচাপ ও সর্বনিম্ন রক্তচাপের অন্তরফলকে স্পন্দন চাপ বলে। অপরপক্ষে, চাপ স্পন্দন রক্তচাপের দ্বারা সৃষ্টি তরঙ্গবিক্ষেপ, যা মহাধমনীতে নিলয়ের রক্ত-উৎক্ষেপণের ফলে উৎপন্ন হয় এবং রক্তজালকের মধ্যে মাত্রার দিকে এগিয়ে যায়।

৩. ধমনীর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী প্রত্যাবর্তকসমূহ (Factors regulating arterial blood pressure) : নিম্নলিখিত প্রত্যাবর্তকগুলি ধমনীর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে—

1. হৃদ্‌গতি (Heart rate) : হৃদ্‌গতি স্বাভাবিকের তুলনায় (প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাভাবিক হৃদ্‌গতি মিনিটে ৭২-৮০ বার) বেশী হ'লে রক্তচাপও বৃদ্ধি পায়।

2. রক্তের পরিমাণ (Blood volume) : রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে রক্তচাপও বৃদ্ধি পায়।

3. রক্তের বেগ (Velocity of blood) : রক্তপাতে রক্তের বেগ বৃদ্ধি পেলে রক্তচাপও বৃদ্ধি পায়। এই কারণে মহাধমনীর রক্তচাপ অপেক্ষাকৃত বেশী এবং রক্তজালকের রক্তচাপ অপেক্ষাকৃত কম।

4. রক্তের সান্দ্রতা (Viscosity of blood) : রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে [illegible] প্রসারণজাত রক্তচাপ পরিবর্তিত হয়। রক্তের সান্দ্রতা প্রধানতঃ প্রোটীন থাকার উপর ভিত্তি করে। রক্তের সান্দ্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে আপেক্ষিক ঘর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

5. ধমনীপ্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of arterial wall) : ধমনীপ্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পেলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, এই কারণে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ বাড়তে থাকে।

6. রক্তবাহের গহ্বর (Lumen of blood vessels) : রক্তবাহের গহ্বর যত সঙ্কুচিত হয় ততই রক্তচাপও তত বেড়ে যেতে থাকে।

7. হৃদ্‌-উৎপাদ (Cardiac output) : হৃদ্‌-উৎপাদ বৃদ্ধি পেলে রক্তচাপও বৃদ্ধি পায়।

8. হরমোনের উপস্থিতি (Presence of hormones) : হরমোন অ্যাড্রিনালিন এবং থাইরক্সিন রক্তধমনীর সংকোচন ঘটিয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং প্রাতিকাইনিন রক্তধমনীর প্রসারণ ঘটিয়ে রক্তচাপ কমায়।

9. স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) : স্নায়ুতন্ত্র ভ্যাসোমোটর (vasomotor) ব্যবস্থার মাধ্যমে ধমনীর (arterioles) ব্যাস কমিয়ে এবং বাড়িয়ে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখে।

10. প্রান্তীয় বাধা (Peripheral resistance) : রক্ত যখন দেহ-প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয় তখনই তা এই বাধার সম্মুখীন হয়। বাধা প্রধানতঃ আসে উপধমনী ও রক্তজালক থেকে। প্রান্তীয় বাধা প্রধানতঃ রক্তের সান্দ্রতা, রক্তের প্রবাহ, উপধমনীর স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তবাহী আভ্যন্তরীয় ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। প্রান্তীয় বাধার উপর রক্তচাপ নির্ভর করে।

11. অন্যান্য কারণ : অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব, অক্সিজেনের অভাব, হিস্টামিন, বিষাক্তকর পদার্থ ইত্যাদি মসৃণপেশি রক্তবাহীর উপর ক্রিয়া করে তাদের প্রসারণ ঘটিয়ে রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটায়।

3.38 রক্তচাপ নির্ণয় (Determination of Blood Pressure) :

মানুষের রক্তচাপ প্রধানতঃ **আসকালটেটরি পদ্ধতি** এবং **পালপেটরি পদ্ধতিতে** নির্ণয় করা হয়।

1. **অ্যাসকালটেটরি বা শ্রুতিভিত্তির পদ্ধতি** (Auscultatory method) : এই পদ্ধতিতে রক্তচাপ নির্ণয়ের জন্য রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্র **স্ফিগমোম্যানোমিটার** (sphigmomanometer) এবং বক্ষবীক্ষণ যন্ত্র **স্টেথোস্কোপ** (stethoscope) দরকার।

□ **পদ্ধতি (Procedure) :** (i) যে ব্যক্তির রক্তচাপ নির্ণয় করা হবে তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে অথবা টেবিলে শায়িত করে উহার উর্ধ্ব বাহুর (কনুই-এর কিছু উপরে) চারদিকে রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের বাহুবন্ধটিকে (cuff) টান-টান করে বেঁধে দিতে হবে। যন্ত্রটিকে ব্যক্তিটির হৃৎপিণ্ডের সমতলে রাখতে হবে।

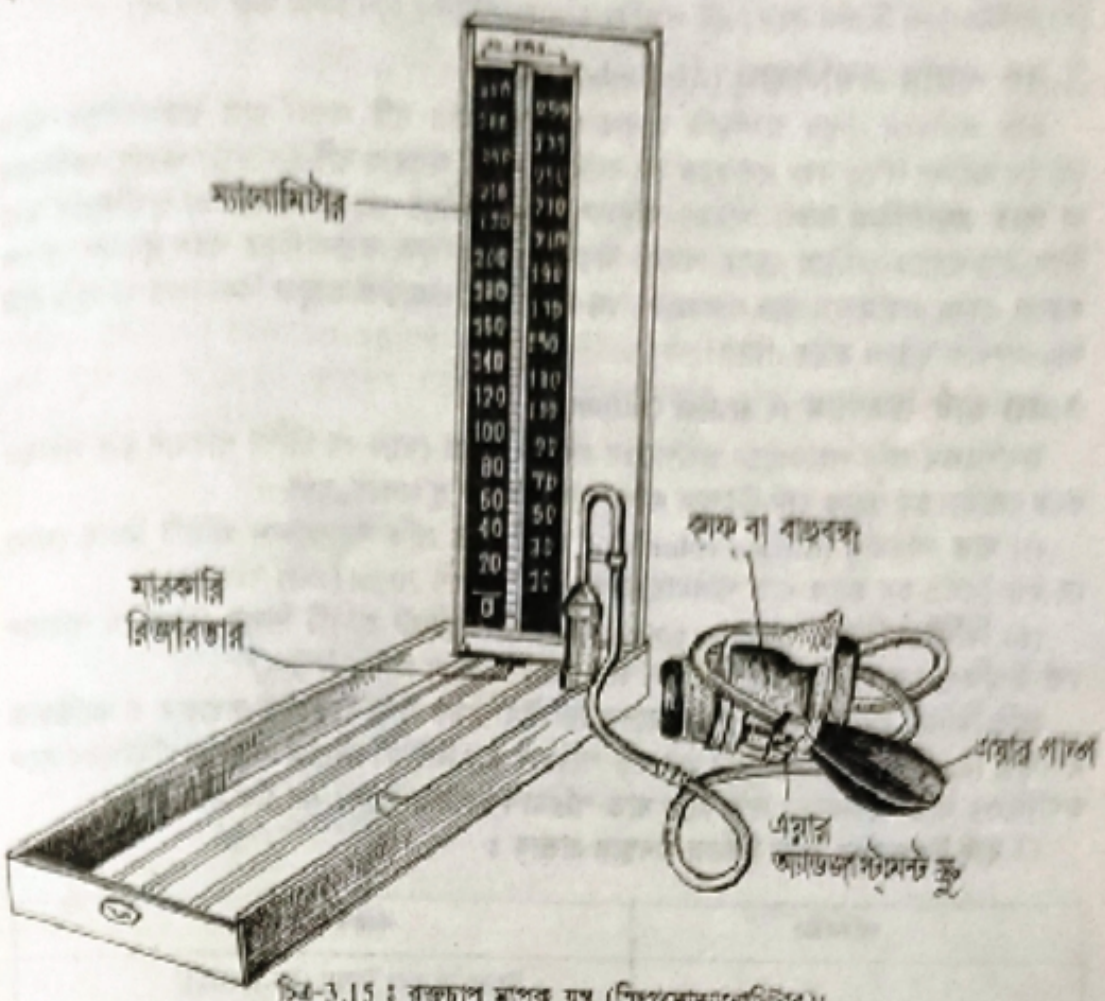

চিত্র-3.15 : রক্তচাপ মাপক যন্ত্র (স্ফিগমোম্যানোমিটার)।

(ii) এখন স্টেথোস্কোপের চেস্ট-পিস্‌টি (chest piece) বাহুবন্ধের নীচে ব্রাকিয়াল ধমনীর উপর রেখে স্টেথোস্কোপের মুক্ত প্রান্ত দু'টিকে অর্থাৎ ইয়ার-পিস্ (ear piece) দুটিকে দু-কানে লাগাতে হবে।

(iii) এখন বায়ু-পাম্পের (air pump) স্ক্রুটি এঁটে পাম্প ক'রে বাহুবন্ধের মধ্যে বায়ুচাপ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে রক্তচাপ-নির্ণায়ক যন্ত্রের ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভ 200 mm পারদচাপের সমান হয়।

(iv) এখন বায়ু পাম্পের স্ক্রুটি আলগা করে ধীরে ধীরে ম্যানোমিটারের পারদস্তম্ভকে নামাতে হবে এবং বিশেষ ধ্বনি শোনার জন্য তৎপর হ'তে হবে।

(v) পারদস্তম্ভ নামার সময় প্রথম যে ধ্বনি বা শব্দ শোনা যাবে তা সিস্টোলিক রক্তচাপের নির্দেশক। এই শব্দ ধারাবাহিকভাবে কিছুক্ষণ হওয়ার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। শব্দ অন্তর্হিত হওয়া ডায়াস্টোলিক রক্ত চাপের নির্দেশক। শব্দ শুরু এবং শেষ হওয়ার সময় ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভের উচ্চতা দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

2. **প্যালপেটরি পদ্ধতি** (Palpatory method) : এই পদ্ধতিটি অ্যাসকালটেটরি পদ্ধতির মতই, তবে এক্ষেত্রে স্টেথোস্কোপের প্রয়োজন হয় না।

এক্ষেত্রে রেডিয়াল ধমনীর উপর আঙ্গুল রেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়। রক্তচাপ নির্ণয়ক যন্ত্রের বায়ু পাম্পের সাহায্যে ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভ 200 mm পারদ-চাপের সমান তুলে দিয়ে হয়, ফলে নাড়ী-স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। পরে বায়ু চাপ ধীরে ধীরে কমাতে থাকলে যে মুহূর্তে নাড়ী-স্পন্দন ফিরে আসে তখন ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভের তল যেখানে থাকে তাকেই সিস্টোলিক চাপ নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতে ডায়াস্টোলিক চাপ নির্ণয় করা যায় না।

3.39 এয়ার এম্বলিজম্ (Air Embolism) :

রক্ত সংবহনে বায়ুর উপস্থিতি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র রক্তনালীতে গ্যাস বুদ্-বুদ্ আটকা প'ড়ে রক্ত প্রবাহকে বন্ধ করে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে এয়ার এম্বলিজম্ বা গ্যাস এম্বলিজিম্ বলে। সামান্য পরিমাণ বায়ু ধমনীতে প্রবেশ করলে তা হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম রক্তনালীতে গ্যাস বুদ্-বুদ্ প্রবেশ করলে এয়ার এম্বলিজম্ হয়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে মারাত্মক স্নায়ুজ বিকারগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, এমনকি মৃত্যুও হ'তে পারে।

সৃষ্ট হয়। ... খুব কষ্টসাধ্য, কারণ এর স্থায়িত্বকাল মাত্র 0.1 সেকেণ্ড।

3.37 রক্তচাপ (Blood Pressure) :

A. সংজ্ঞা (Definition) : **রক্তবাহের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্ত রক্তবাহের প্রাচীরে যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকেই রক্তচাপ বলে।**

প্রবাহিত রক্ত ধমনীগাত্রে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে তাকে **ধমনী রক্তচাপ**, শিরাগাত্রে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে তাকে **শিরা রক্তচাপ** এবং রক্তজালকে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে তাকে **জালিকা রক্তচাপ** বলে। রক্তচাপ বলতে প্রধানত ধমনী রক্তচাপকে বোঝায়।

রক্তচাপের প্রধান কাজগুলি হ'ল—(i) রক্তপ্রবাহকে বজায় রাখা, এবং (ii) রক্তজালিকায় পরিস্রাবণের প্রয়োজনীয় চাপের জোগান দেওয়া। রক্তজালিকার পরিস্রাবণ প্রধানত কলাকোষের পুষ্টি, মূত্র উৎপাদন, কলাকোষ ও লসিকা উৎপাদন প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্কযুক্ত।

B. **রক্তচাপের প্রকারভেদ** (Types of blood pressure) : রক্তচাপ চার প্রকারের যথা—

(i) **সংকোচী চাপ বা সিস্টোলিক প্রেসার** (Systolic pressure) : হৃৎপিণ্ডের সিস্টোল অবস্থায় অর্থাৎ সংকোচনশীল অবস্থায় যে সর্বাধিক চাপ সৃষ্টি হয় তাকে সিস্টোলিক প্রেসার বলে। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক সিস্টোলিক প্রেসার হ'ল 110-130 mm Hg (গড়ে 120 mm Hg)।

(ii) **প্রসারী চাপ বা ডায়াস্টোলিক প্রেসার** (Diastolic pressure) : হৃদ্‌পিণ্ড যখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ শিথিল অবস্থায় থাকে তখন যে সর্বনিম্ন চাপ সৃষ্টি হয় তাকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলে। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক প্রেসার হ'ল 70-90 mm Hg (গড়ে 80 mm Hg)।

(iii) **স্পন্দন চাপ বা পালস্ প্রেসার** (Pluse pressure) : সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপের অন্তরফলকে পালস্ প্রেসার বলে। (P.P. = 120−80 = 40 mm Hg)।

(iv) **গড় চাপ বা মিন প্রেসার** (Mean pressure) : সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপের গাণিতিক গড় (arithmatic mean)-কে গড় চাপ বলে। অথবা, ডায়াস্টোলিক চাপ এবং স্পন্দন চাপের এক-তৃতীয়াংশের যোগফলকে মিন প্রেসার বা গড় চাপ বলে।

সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক এবং পালস্ প্রেসারের স্বাভাবিক অনুপাত 3 : 2 : 1 অর্থাৎ সিস্টোলিক চাপ 120 mm Hg হ'লে ডায়াস্টোলিক চাপ ও পালস্ চাপ হবে যথাক্রমে 80 ও 40 mm Hg।

3.3 লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Red Blood Corpuscle or R.B.C.or Erythrocyte) :

ইহা রক্তে অবস্থিত হিমোগ্লোবিনযুক্ত কণিকা। মানুষের পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। এমনকি গলগি বডি, সেন্ট্রিওল, অন্তঃকোষ জালক, রাইবোসোম এবং অধিকাংশ মাইটোকন্ড্রিয়া বিলুপ্ত হয়। ফলে লোহিত কণিকা অধিক পরিমাণে অক্সিজেন পরিবহণ করতে সক্ষম হয়। তাই লোহিত কণিকা সঠিক অর্থে কোষ নয়। কোষসমূহ রক্তের উপাদান। লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকায় রক্ত লাল বর্ণের হয়।

A. **আকৃতি** (Shape) : লোহিত কণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল নিউক্লিয়াসবিহীন চাকৃতি বিশেষ। লোহিত কণিকার এই আকৃতি তার কার্য সম্পাদন ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কারণ—(i) নিউক্লিয়াস না থাকার ফলে লোহিত কণিকার ধাত্রে অনেক বেশী পরিমাণে হিমোগ্লোবিন থাকে, ফলে অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (ii) দ্বি-অবতল আকৃতির জন্য এদের তলীয় ক্ষেত্রফল অনেক বেশী হয় এবং অধিক পরিমাণ গ্যাসের সংস্পর্শে আসে, ফলে হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযুক্তি ও বিয়োজন দ্রুত হয়।

B. **আয়তন** (Size) : রক্ত-প্রলেপে স্বাভাবিক লোহিত কণিকার ব্যাস 5.5 μm-8.8 μm। প্রান্তদেশ 3.2μm এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল 1μm পুরু।

C. **সংখ্যা** (Number) : একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রক্তে প্রতি ঘন মিলিমিটারে বা মাইক্রোলিটারে গড়ে 5 মিলিয়ন বা 50 লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে। [স্ত্রীলোকদের 4.5 মিলিয়ন, শিশুদের 6-7 মিলিয়ন এবং ভ্রূণে 7.8 মিলিয়ন।] প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা 5 মিলিয়নের চেয়ে 25% হ্রাস পেলে **রক্তাল্পতা** দেখা দেয়; তেমনি প্রতি ঘন মিলিমিটারে তাদের সংখ্যা 6.5 মিলিয়নের অধিক হ'লে তাকে **পলিসাইথেমিয়া** বলে।

D. **গঠন** (Structure) : লোহিত কণিকা **কোষঝিল্লি** এবং **স্ট্রোমা** বা ধাত্র নিয়ে গঠিত। কোষঝিল্লির গঠন অন্যান্য কোষঝিল্লির মত। এতে 35% লিপিড, 60% প্রোটিন এবং সামান্য পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট থাকে। কোষঝিল্লির মধ্যে ধাত্র থাকে। ধাত্র থেকে হিমোগ্লোবিন সরিয়ে নিলে উহার মধ্যে 50% প্রোটিন এবং 13% লিপিড পাওয়া যায়। ধাত্রে 60-70 ভাগ জল এবং 30-40 ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে। কঠিন পদার্থগুলি হ'ল—হিমোগ্লোবিন (2 শতাংশ), প্রোটিওলিপিড, ইউরিয়া, অ্যামাইনো অ্যাসিড, পটাশিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।

E. **জীবনকাল** (Span of Life) : সংবহন তন্ত্রে লোহিত কণিকার জীবনকাল থাকে 120 দিন।

F. **কার্যাবলী** (Functions) : লোহিত কণিকার প্রধান কার্যগুলি হল—(i) O_2 এবং CO_2 পরিবহন করা, (ii) রক্তের সান্দ্রতা বজায় রাখা, (iii) রক্তের পরাস্রুত ও অপরাস্রুত চাপের সাম্যাবস্থা বজায় রাখা, (iv) লোহিত কণিকাস্থিত হিমোগ্লোবিন ও কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ রক্তের অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা বজায় রাখে, (v) বিনষ্ট হিমোগ্লোবিন থেকে নানাপ্রকার রঞ্জক পদার্থ সৃষ্টি হয়।

G. **লোহিত কণিকার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি** (Origin and Development of R.B.C.) :

a) **উৎপত্তিস্থল** : ভ্রূণ অবস্থায় ভ্রূণের ভাসকুলোসা (vasculosa) অঞ্চল থেকে লোহিত কণিকার উৎপত্তি হয়। ভ্রূণ অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ এর মাস পূর্ব পর্যন্ত লোহিত কণিকা উৎপাদনের একমাত্র স্থান হল **যকৃৎ** এবং **প্লীহা**। জন্মের পর লোহিত কণিকার একমাত্র উৎপত্তিস্থল **লাল অস্থিমজ্জা**।

b) **বৃদ্ধির ক্রমপর্যায়** : প্লুরিপোটেন্ট হিমোসাইটোব্লাস্ট-এর (pluripotent haemocytoblast) বহুবিভাজন এবং রূপান্তর থেকে প্রোজেনিটর কোষ **প্রোএরিথ্রোব্লাস্ট** (proerythroblast) উৎপন্ন হয়। এই কোষের বহুবিভাজন ও রূপান্তরের মাধ্যমে পরিণত লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। রূপান্তরের তিনটি পর্যায় হল—(i) কোষাকৃতির ক্রমান্বয় হ্রাসপ্রাপ্তি, (ii) হিমোগ্লোবিন সংযুক্তি, এবং (iii) নিউক্লিয়াসের বিলুপ্তি। লোহিত কণিকার বৃদ্ধির ক্রমপর্যায়গুলি হল—হিমোসাইটোব্লাস্ট → প্রোএরিথ্রোব্লাস্ট → প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট → মাধ্যমিক নরমোব্লাস্ট → পরবর্তী নরমোব্লাস্ট → রেটিকিউলোসাইট → পরিণত লোহিত কণিকা।

চিত্র-3.1 : লোহিত কণিকার বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম।

(i) **হিমোসাইটোব্লাস্ট** (Haemocytoblast) : ইহা আদিম ও অপরিণত কোষ। ইহা প্লুরিপোটেন্ট কোষ নামে পরিচিত। ইহা 18-23μ ব্যাসবিশিষ্ট। কোষে বৃহদাকার নিউক্লিয়াস এবং ক্ষারযুক্ত সাইটোপ্লাজম থাকে। এরা রূপান্তরিত হয়ে **প্রোএরিথ্রোব্লাস্ট** কোষ গঠন করে।

(ii) **প্রোএরিথ্রোব্লাস্ট** (Proerythroblast) : ইহা বৃহদাকার এবং 14-19μ ব্যাসবিশিষ্ট। নিউক্লিয়াস বড় এবং স্পষ্ট। হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত। ইহা রূপান্তরিত হয়ে প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট গঠন করে।

(iii) **প্রারম্ভিক নরমোব্লাস্ট** (Early normoblast) : ইহা আকারে ছোট (11-17μ)। নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওলাস অনুপস্থিত। এই কোষ বিভাজিত হয়ে মাধ্যমিক নরমোব্লাস্ট গঠন করে।